Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.76-83
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাঙালির 'বাউল': প্রেক্ষিত উনিশ শতক

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

The man as an individual has gradually started to unite by following the trend of social evolution. By accepting the naturalistic approach of 'Survival of the fittest' and ignoring the caste-creed related issues and communalism, the folk religion of Baul and Baul communities gradually emerged in Bengal. The most interesting chapter is that in the history of the ruling-exploitation of the upper classes of the society, the emergence of folk religion Baul as a strong rejection to the strict rules of Brahmanism based on Vedas and the orthodox approach of Islam has developed throughout the 19th Century. Standing at the centre-point of a society in the 19th Century which was full of self-crisis, the iconic worshipper of Baul religion Lalan Shai gradually tried to develop a single and integrated religious consciousness where the adoration of man as a human being stood at the focal point of religion. In addition to the greatest glory of Brahmanism and Islam as an institutional religion, a quiet stream of popular folk religion 'Baul' continued to flow in the life of Bengal in this period. An almost lost chapter of the 19th Century can be traced if the journey of 'Baul' can be explored and analysed as a chronological social context.

Keyword: evolution; communalism; folk; Baul; religion; society; literature

"কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশবিদেশে
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনা'সে।" [মান্নান, ২০১৫ : পৃ. ২৭৫]

প্রাণীজগতে মানুষের বিজয়-পতাকা উড়তে শুরু করেছিল সেদিন থেকে, যেদিন থেকে আপন প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে একক মানুষ ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। প্রতিটি কার্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মতোই ক্রমশ একদিকে যেমন গড়ে উঠল সমাজ, সমাজনীতি, সম্প্রদায়-ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতি, অঞ্চল বিভাজন বা অঞ্চল পরিচালনার নীতিসমূহ বা রাজনীতি, আরেকদিকে তেমন সমাজজীবনের নানা নঞর্থক দিকগুলি, যেমন- লোভ, লালসা, জিঘাংসা, আঞ্চলিক ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদিও সমানতালে বেড়ে চলল। চক্রাকারে মানব ইতিহাস বিবর্তিত হয়ে চলেছে আজও। আর সামাজিক এই বিবর্তনকে মান্যতা দিয়েই বাংলা ও বাঙালির চিরবৈচিত্র্যময় সমাজ-সংসারে একসময়ে আবির্ভাব ঘটেছে লোকধর্ম বাউল এবং বাউল সম্প্রদায়ের। সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষের শাসন-শোষণ, বেদ আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের কঠোর নিয়মকে অগ্রাহ্য করে লোকধর্ম হিসেবে বাউলের উদ্ভব এবং উনিশ শতক জুড়ে তার বিকাশ ইতিহাসের একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অধ্যায়। লোকধর্ম বাউল বা বাউলসাধনার সাথে সম্পৃক্ত যে বিপুল বাউলগানের ভাণ্ডার, তাকে বিশ্বপরিচয় দেওয়ার প্রধানতম কান্ডারি নিঃসন্দেহে মহাত্মা লালন সাঁই। একদিকে জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্যাবৃত অতীত, আরেকদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে উনিশ শতকের আত্মসংকটে দীর্ণ এক সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে প্রথাগত শিক্ষায় অশিক্ষিত অথচ

জীবনশিক্ষায় ভরপুর মানব লালন ক্রমশ গড়ে তুলেছিলেন 'মানুষভজা'র একক অখণ্ড এক ধর্মচেতনা। উনিশ শতকের কালিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতের আলোকে লোকধর্ম বাউলের যাত্রাপথের রূপরেখা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা গেলে উনিশ শতকের একটি প্রায় হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণালোকিত অধ্যায়ের দিকে আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

বাঙালি সমাজ তথা সংস্কৃতির ইতিহাসে উনিশ শতক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে একদিকে যেমন সমাজ-সংস্কৃতির নানা দোদুল্যমানতায়, সংশয়ে-দ্বন্দ্বে গ্রস্ত সমাজমন, আরেকদিকে তেমনি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে সময় এবং সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রেনেসাঁর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ বা বাংলা সাহিত্য যে নবজাগরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঁকবদল করেছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। অথচ, কালবিচারে উনিশ শতকে এমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্ববদল নেই, যার মানদণ্ডে বিচার করে দেখা যায় এই সময়কালের অন্তর্বর্তী অভিঘাত। তবে সূক্ষ্মভাবে দেখলে নবজাগরণের প্রভাবে এই সময়পর্বেও চোখে পড়বে বিক্ষিপ্ত এমন কিছু ঘটনা, যা নিঃসন্দেহে যুগবদলের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। উনিশ শতকের বাংলার যে নবজাগরণের কথা আমরা এখানে বলতে চাই, তা আসলে বাঙালির বৌদ্ধিক নবজাগরণ; পাশ্চাত্যের নবজাগরণের মতো তা শিল্প-স্থাপত্য ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সীমায়িত থাকেনি। বরং তা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে বাঙালির অস্তিত্বে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এইসময় বাঙালি পাশ্চাত্যের ভাষা-সংস্কৃতির সরাসরি সংস্পর্শে আসছে; ফলে বদলে যাচ্ছে তার নিজের সাহিত্যের ভাষা, সাহিত্যের রূপ-রীতি। পুরো উনিশ শতক জুড়েই একদিকে যেমন পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙনের সূত্রপাত এবং অগ্রগমন ঘটেছে, পাশাপাশি নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় বঙ্গসমাজে এই সময় থেকেই ক্রমশ গভীর প্রভাববিস্তার করছে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্র আর শহরকেন্দ্রিক পুঁজিবাদ- এই দুই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাঙালি সমাজ, অর্থনীতি এবং সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। আরেকদিকে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ছাপাখানার বিকাশপর্ব এতদিন ধরে চলে আসা সাহিত্যচর্চার গতিপ্রকৃতি ও ছন্দকে এক নিমেষে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আদি-মধ্যযুগ থেকে শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর সাহিত্যচর্চা এই সময়ে একেবারে সরাসরি ছাপানো বইয়ের হাত ধরে প্রবেশ করছে বাঙালির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যা বাংলা সাহিত্যের বিকাশপ্রাপ্তির পথে খুলে দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত। উনিশ শতকের সমকালে আমরা যদি বাংলার ধর্মীয় জীবনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তবে দেখব যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের প্রবল প্রতাপের পাশাপাশি লোকপ্রিয় ধর্মের ফল্গুধারার এক ক্ষীণ অথচ শান্ত স্রোত বঙ্গজীবনে বহমান থেকেছে এই কালপর্বে। এই লোকপ্রিয় ধর্মগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে এসময়কালে প্রায় শিখরে পৌঁছেছিল লোকধর্ম বাউল। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রীয় এবং লোকজ- ধর্মের এই দু'টি ধারাই মূলত ক্রিয়াশীল ছিল। আর বাউলধর্মের উদ্ভবের মূলে যেহেতু সক্রিয় ছিল শাস্ত্রবিরোধিতা, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির বিপরীতে একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশ হিসেবে তা বিকশিত হয়েছিল প্রধানত সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের মধ্যে। ফলত এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, শুধুমাত্র রেনেসাঁর সূত্র ধরেই নয়, বরং আরো নানা কারণের প্রত্যক্ষ সন্নিবেশে সমৃদ্ধ উনিশ শতক নিঃসন্দেহে সমাজের প্রতিটি স্তরের বাঙালির প্রতিস্পর্ধার জাগরণকাল। অবশ্য বাউল আদৌ কোনো ধর্মমত, নাকি এটি একটি স্বতন্ত্র জীবনাচরণ পদ্ধতি- 'বাউল' নিয়ে পণ্ডিতমহলে এই বিতর্কের সূত্রপাতও হয়েছে উনিশ শতকেই। এইচ. এইচ. উইলসন যেমন বাউলদের 'Minor Religious Sects' বলে অভিহিত করেছেন, ঠিক তেমনি অক্ষয়কুমার দত্ত তাদের 'গৌণ উপাসক সম্প্রদায়' বলেছেন। মন্দির-মসজিদ-গির্জার নিগড়কে ভেঙে সম্পূর্ণ অন্য এক জীবনদর্শনকে সম্বল করে মূলত দেহকে আশ্রয় করে ব্রাত্য অথচ বলিষ্ঠ লোকজীবনসম্পৃক্ত ভাবনা ক্ষীণস্রোতে বয়ে চলেছে এসময়কালে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় আবহাওয়ায় গীতিপ্রবণতার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে শাস্ত্রের বাঁধনকে ত্যাজ্য

ধরে নিয়ে লোকজীবনে প্রচলিত সহজ-সরল বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে বাউলসাধক তথা বাউলশিল্পীরা বাউলসাধনতত্ত্বকে ব্যক্ত করেছেন তাদের গানে। সাহিত্যে ব্যক্তিমনের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের পাশাপাশি সমাজের নানা চারিত্র্যলক্ষণ যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নবজাগ্রত আধুনিক সাহিত্যে, তার ব্যতিক্রম নয় বাউল গানের স্বর্ণোজ্জ্বল ভাণ্ডার। উনিশ শতক জুড়ে লালন ফকিরের মতো স্বভাবশিল্পীর কণ্ঠে যেসব বাউলগান রচিত হয়েছে অবিরাম ধারায়, তাতে উনিশ শতকের সমাজমানস যথার্থভাবে পরিস্ফুট হয়। এইসব গান একদিকে যেমন বাউলসাধনতত্ত্বের আলো-আঁধারি গহীন পথের দিশা দেখায়, আবার ঠিক তেমনি সমসাময়িক সমাজমন ও সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে ওঠার মাধ্যমে তা সততই হয়ে ওঠে 'লোকসাহিত্যের সমাজ-আরশি'।

লোকধর্ম হিসেবে বাউল মত ও পথের সূচনালগ্ন মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বাউল সংক্রান্ত চর্চার জনপ্রিয়তা ও পরিসর মূলত আঠারো এবং উনিশ শতক জুড়েই সর্বাধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'- মধ্যযুগের মরমি কবি চণ্ডীদাসের লেখা এই মতটি তৎকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাউল সম্প্রদায়ের মনন-চিন্তনে একইভাবে ক্রিয়াশীল। বাউলের মত, পথ, চিন্তা, তত্ত্ব ও জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের আগ্রহ এবং কৌতূহল বহুদিনের। আগেই বলা হয়েছে যে, সূচনালগ্ন থেকেই লোকায়ত সাধনার এই ধারাটির সঙ্গে মূলত যুক্ত ছিল অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ। ফলত বাউলদের গুহ্য সাধনপন্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় স্বভাবতই তথাকথিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী একটি বিশেষ সমাজের মানুষজন বাউলদের বারবার 'কামাচারী', 'কদাচারী' বলে আক্রমণ করেছেন অবিরত। আসলে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজমানসে ইউরোপীয় 'ভিক্টোরিয়ান' সংস্কার এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, লোকধর্ম বাউলে যৌনচেতনার সুস্থ স্বীকৃতির বিষয়টিকে উনিশ শতকীয় সমাজ কখনোই মেনে নিতে পারেনি। এই নিন্দার পাশাপাশি আবার এই সময়কালেই সুবিবেচক সুশিক্ষিত সমাজের আরেকটা অংশ এবং সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার মানুষেরা বাউলদের বিষয়ে সহানুভূতিশীলও ছিলেন। বাউলতত্ত্ব, দর্শন এবং পদাবলি তাদের নানাভাবে প্রভাবিত, মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্বরা ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের কথা বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে এসময়কালে বাংলার প্রচলিত গতানুগতিক সমাজজীবনে যে বিপ্লব ঘটে গেছিল, তার সুফল ভোগ করেছিল নগরকেন্দ্রিক জনপদগুলি এবং মূলত কলকাতা। বাংলার গ্রামজীবনে নবজাগরণ বৃহৎ অর্থে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। এছাড়া মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি হিন্দুরা উনিশ শতক কেন্দ্রিক রেনেসাঁয় যে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তুলনায় বাঙালি মুসলমানরা ততটা সক্রিয়ভাবে এই নবজাগরণ দ্বারা প্রভাবিত হননি নানা কারণে। যেমন- আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতক জুড়েই বাঙালি মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মুঘল আমলে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় যে সামাজিক অবস্থানে ছিল, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও পরবর্তীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতে আধিপত্য বিস্তারে তা স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট হয়। শরিয়তপন্থী অভিজাত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। আর অনভিজাত মুসলমানরা, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল ধর্মান্তরিত, উচ্চবর্ণের শাসন-শোষণে, করের বোঝায় আর্থিকভাবে তারা এতটাই অনগ্রসর ছিলেন যে, তাদের মধ্যে নবজাগরণ ঘটা সম্ভবপর হয়নি। পাশাপাশি উনিশ শতকে সরকারি কাজে রাজভাষা ফারসির চর্চা কমিয়ে ইংরেজি ভাষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বাঙালি হিন্দুরা পাশ্চাত্যভাষার চর্চায় সরাসরিভাবে যুক্ত হলেও বাঙালি অভিজাত মুসলমান সমাজ ইংরেজি ভাষার চর্চা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। ফলে তারা ভাষা-ক্ষমতায়নের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একাধিপত্যের অলিন্দে বাঙালি হিন্দুদের মতো প্রবেশাধিকার পাননি। নগর কলকাতা এবং তার আশেপাশে অবস্থিত জনপদগুলিকে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালি হিন্দুরা প্রায় দখল করে বসেছিলেন। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক চর্চার জগত একান্তভাবেই বাঙালি হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ফলত পাশ্চাত্য প্রভাবিত এই নবজাগরণ থেকে বাঙালি মুসলমানদের একটা সচেতন তৈরিকৃত দূরবর্তী অবস্থান চোখে পড়ে। এমনকি উনিশ শতকে 'বাঙালি'-র জাতিগত পরিচয়ের সাথে 'হিন্দু'-দের সম্প্রদায়গত একটা সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় বাঙালি মুসলমানরা এক আত্মপরিচয়জনিত সংকটে দীর্ণ বোধ করেছিলেন। ফলত নানা মতানৈক্য থাকলেও যুক্তিগত ভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, একটি বিশেষ স্থান-কাল ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই উনিশ শতকীয় নবজাগরণ মূলত সীমায়িত ছিল। সম্প্রদায়ভিত্তিক চেতনা এইসময় বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিকে রীতিমতো নিয়ন্ত্রণ করেছে। অথচ আমরা সমকালেই দেখতে পাব বাউলের মতো এমন এক ধর্মমতকে, যা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শরিয়তি ইসলাম ধর্মের প্রবল প্রতাপ, বৈদিক অনুশাসনকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ, সুফিবাদের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে গ্রহণ করে সাম্য, মৈত্রী ও মানবতাবাদের এক উদারপন্থী মতকে বাঙালি সমাজে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে। লোকধর্ম বাউলে পরধর্মসহিষ্ণুতা তথা উদারপন্থী মনোভাব এত দৃঢ় বলেই হয়তো জন্মসূত্রে কেউ বাউল হয় না। আর সেই অর্থে গ্রামীণ বঙ্গদেশে উনিশ শতকে সম্প্রদায়-বিভেদের অচলায়তন ভেঙে মানবতাবাদের জয়পতাকা উড়িয়ে প্রথম শঙ্খধ্বনি দেন লোকধর্ম বাউলের অন্যতম প্রবক্তা লালন সাঁই। অথচ উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসের প্রবক্তারা প্রায় সকলেই এই বিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব। উনিশ শতকের বাঙালির পুঁথিগত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গ্রামীণ অন্ত্যজ জীবনের নবজাগরণের এবং অসাম্প্রদায়িক গণআন্দোলন নির্মাণের যে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হয়ে রইলেন লালন সাঁই, ইতিহাসের সেই অবহেলিত দিকটির প্রতি গবেষণাসূত্রে আজও তেমনভাবে দৃক্‌পাত করা হয়নি। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রায় যুগবিভাগের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ইতিহাসকেই কার্যত এক নতুন পথে চালিত করলেন মধ্যযুগকে প্রায় আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা চৈতন্যদেব; অথচ ইতিহাসের এই উত্তরাধিকার কিন্তু লালনের ক্ষেত্রে অনুসৃত হল না, একথা ভাবতে বিস্ময় জাগে বৈকি! এর পেছনে হয়তো লুকোনো রয়েছে ক্ষমতাতন্ত্র দ্বারা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের গ্রহণ-বর্জনের পন্থা। লালনকে কি ইতিহাস শুধুমাত্র একজন বাউল সাধক ও শিল্পী হিসেবেই মনে রাখবে? বাঙালির ইতিহাসের সম্প্রীতিমূলক গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায় এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় আজও নিভুনিভু হয়ে জ্বলতে জ্বলতে কি হঠাৎ একদিন হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির গাঢ় আঁধারে? এ প্রসঙ্গে লালন-গবেষক প্রাবন্ধিক আবুল আহসান চৌধুরীর একটি বিশেষ উক্তি স্মর্তব্য-

> "উনিশ শতকে বাঙালি ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। সেই ঘুম-ভাঙানিয়া ফেরিঅলা ছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর ডাক তো শুনেছিলেন শুধু কলকাতার মানুষ আর তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল বাংলার দু'চারটি বড়ো মফস্বল শহরে। কিন্তু আঁধারে ঢাকা পড়ে রইলো বৃহত্তর বঙ্গদেশের গ্রামের পর গ্রাম। সেই গ্রামদেশে মাটির প্রদীপ জ্বালালেন লালন ফকির। প্রতিক্রিয়ার দমকা হাওয়ায় বারবার সেই আলো নিভে যেতে চায়, লালন বুক দিয়ে আগলে রেখে সেই আলোর শিখার বলয় প্রসারিত করলেন বিশাল বাংলায়। রামমোহন নিজে লেখাপড়া জানতেন- তাঁর অনুসারীরাও, তাই তাঁর কীর্তি-কর্মের কথা পাঁচমুখে প্রচার পেলো। কিন্তু উচ্চবর্গের ভদ্রজনের উপেক্ষা-অবহেলায় লালন চাপা পড়লেন। কে তাঁর কথা বলবে? পেশাদার ইতিহাসবিদেরা এ-বিষয়ে নীরব হয়ে রইলেন বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে। একবার অমলেন্দু দে কথাটি তুলেছিলেন আর অন্নদাশঙ্কর রায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : 'বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব'।" [চৌধুরী, ২০১৫ : পৃ. ১৮]

উনিশ শতকের সমাজমানস কেন্দ্রিক যে কোনো আলোচনায় নারীর ভূমিকা ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব। উনিশ শতক পূর্ববর্তী কালে নারী যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পদদলিত হতে হতে ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়ে পর্দানশীন গতানুগতিক দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, উনিশ শতকে আলোকায়নের প্রভাবে নারীর এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন আসে। সমাজে-সংসারে-সাহিত্যে এসময় ক্রমশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভরপুর, সুশিক্ষায় অমলিন, স্বমহিমায় ভাস্বর হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় তার পদচারণার সমুজ্জ্বল যাত্রা। লক্ষ করলে দেখব, লোকধর্ম বাউলে রয়েছে নারীর জাগরণ কেন্দ্রিক সদর্থক ভূমিকা। একদিকে যেমন সাধনসঙ্গিনীকে ছাড়া লোকধর্ম বাউলের সাধনপন্থার সাফল্যপ্রাপ্তি সম্ভবপর নয়, তেমনি আরেকদিকে বাউলদের রচিত গানেও নারী এক মহিমান্বিত অবস্থানে সদাবিরাজিত। যাকে কেন্দ্র করে বাউলদের জনপ্রিয়তা লোকসমাজ থেকে নাগরিকসমাজ পর্যন্ত সুবিস্তৃত হয়েছে, সেই লালন ফকির উনিশ শতকের ঘুণধরা যন্ত্রণাদীর্ণ আবর্তে তলিয়ে যাওয়া সমাজের জাত-ধর্মের গণ্ডিকে আজীবন অস্বীকার করে পুরুষ আর নারীর ভেদাভেদকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে দিয়েছেন সর্বাত্মক স্বীকৃতি-

"কতো ভাগ্যের ফলে না জানি পেয়েছো এই মানবতরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সুধারায় যেন ভারা না ডোবে।" [মান্নান, ২০১৫ : পৃ. ৩৫৬]

সাম্প্রদায়িক ধর্মের সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে, মন্দির-মসজিদের বাঁধন ছিন্ন করে লোকধর্ম বাউল অপরাপর বাঙালি সমাজকে এক উদার মিলনক্ষেত্রের সন্ধান দিয়েছে উনিশ শতকে। বাউলদের উত্থানের পিছনে প্রথম থেকেই যেহেতু সক্রিয় ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণির ক্ষমতাশীল মানুষদের শাসন-শোষণ-অবিচার, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় সংকীর্ণতা, গোড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বৈষম্যময় রক্তচক্ষুর এক বেদনাদায়ক অধ্যায়, তাই স্বাভাবিকভাবেই বাউলধর্ম নিজেকে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে সর্বাগ্রে এক অখন্ড মানবধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিল; সমস্ত ধর্মীয় বাহ্যিক আচার-আচরণকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তা হয়ে উঠতে চেয়েছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক অধিকারবঞ্চিত ব্রাত্য মানুষের জীবনবেদ। জাতবিচারের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে বাউলরা তাই নিজেদের মন্ত্রহীন বলে পরিচয় দিতে পেরেছেন সগর্বে। বাউলরা যে সমাজপ্রচলিত জাতবিচারের অসারতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিল, তার সর্ববৃহৎ প্রমাণ পাওয়া যায় উনিশ শতকে রচিত বাউলশিরোমণি লালনের একাধিক গানে-

"জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।" [মান্নান, ২০১৫ : পৃ. ২৩৮]

সমস্ত দেশ-কাল-যুগেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচার, ধর্মানুশাসনের গণ্ডির বাইরে গিয়ে, জাত-পাত-সম্প্রদায়কে অস্বীকার করে জীবনের সহজ সত্য ও প্রেমের আলোকে ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন, এবং সমন্বয়-মিলনের এক অভিনব বাণী প্রচার করেছেন। এইভাবে ক্রমশ উনিশ শতকে বৃহত্তর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সমাজে শাস্ত্রশাসিত ধর্মান্ধ জগতে বাউলধর্ম এক মানবতাবাদসিক্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করেছে। প্রাচীন ভারতের বর্ণভেদ, চতুর্বর্ণ প্রথা, জাতিগত-সম্প্রদায়গত বিভেদ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সামাজিক ও শ্রেণিগত শোষণ- এসবকে ভেদ করে বাউলধর্ম এক সর্বসংস্কারমুক্ত মানবিক আদর্শে বিশ্বমানবতাবোধকে কেন্দ্রে রেখে এক উদার ধর্মধারণার জন্ম দেয়। তাই বাউলরা 'অন্তরঙ্গে মরমি', 'বহিরঙ্গে দ্রোহী'। বাঙালির যে হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সেখানে দেখা যায়, ভক্তি আন্দোলন, মরমিয়াবাদ এবং সর্বোপরি মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ চৈতন্যদেবের হাত ধরে বারবার আবহমান বাংলার ধর্মের সাম্প্রদায়িকতার অচলায়তনের মূলে কুঠারাঘাত করে হৃদয়ের আলোকে প্রতিষ্ঠিত যে চিরপ্রেমের ধর্ম, মানুষের ধর্ম, তাই

বারবার আপন আলোকে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের পুনর্জাগরণ বা বাউলধর্মের মত-পথের মধ্যে যতই স্ববিরোধী বীজ অন্তর্নিহিত থাকুক না কেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, উনিশ শতকে সার্বিকভাবে বাঙালির সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত আলোকোজ্জ্বল জাগরণে লোকপ্রিয় বাউলধর্ম তথা বাউল সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

উনিশ শতকে একদিকে যেমন বাউল মতবাদ উৎকর্ষের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, ঠিক তেমনি এই সময় থেকেই এর অবক্ষয়ও শুরু হয়। আর, একথা তো অনস্বীকার্য যে, দুই বাংলায়ই বর্তমানে ধর্মীয় বিরোধ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এতটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, বর্তমান অবস্থায় বাউল মতবাদ দুই বাংলায়ই নিভুনিভু দীপের মতো নিজের অস্তিত্বকে কোনোরকমে টিকিয়ে রেখেছে এবং তা হয়ে উঠেছে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সংস্কৃতির অংশ। বর্তমানে বহু গবেষক বাউলসাধনতত্ত্ব এবং লালন সাঁইকে কেন্দ্র করে সারস্বত সাধনায় ব্রতী হলেও এই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। লোকধর্ম বাউলের অবক্ষয়ের এই সূত্রপাত উনিশ শতকের একেবারে প্রথমার্ধে সংগঠিত ওয়াহাবি (১৮২৩-১৮৮৫) ও ফরাজি (১৮১৮-১৯০৬) আন্দোলনের সূত্রে। বাংলার মুসলমান সমাজের উপর এই দু'টি আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম ধর্মের আমূল সংস্কারসাধন ও মুসলিম সমাজের বিস্তারের অভিপ্রায় নিয়ে এই দু'টি আন্দোলনই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি মত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল যে, ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে ইসলাম ধর্ম এবং কোরান বিরোধী নানা কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে। এর ফলে বলাই বাহুল্য, শরিয়তি ইসলাম ধর্মের অনুশাসনকে সরাসরি বর্জন করে মুসলমান সমাজের যেসকল মানুষ লোকধর্ম বাউলকে গ্রহণ করেছিলেন, তারা এই আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজের কোপের মুখে পড়েন। এমনকি বহু মুসলমান বাউলকে এইসময় বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। বারবার বাউলসমাজের উপর সমাজের উচ্চশ্রেণির ক্ষমতাবান মানুষদের শাসন-শোষণ-ক্রোধ-ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকধর্ম বাউলকে জনমানস থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়ার ইচ্ছে থেকে বারবার হিন্দু গোড়া ধর্মধ্বজাধারীরা এবং শরিয়তপন্থী মুসলমানেরা এদের উপর যথেচ্ছভাবে নিগ্রহ ও অত্যাচার চালিয়েছেন। বাউলরা সমস্ত অত্যাচারকে তুচ্ছ করে তবু যে জাতিভেদহীন সমাজের সমস্ত ধর্মের মিলনক্ষেত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাকে হিন্দু বা মুসলমানরা কেউই অনুমোদন করেননি। সর্বোপরি মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমেদের 'বাউলধ্বংস ফৎওয়া'-তে স্পষ্টভাবে বাউলদের প্রতি মুসলিম সমাজ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। বাউলবিরোধী আন্দোলনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকলেও তৎকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশ্য ও চোরাগোপ্তা নানাভাবে বাউলদের উপর নিগ্রহ হয়েছে। একতারার মাটির সুরের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে টিকি-দাঁড়ি-লাঠির তীব্র শাসন। লোকধর্ম বাউলের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা যিনি, সেই লালন সাঁই স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন যে, উনিশ শতকের ধর্মীয় গোঁড়ামি আর ভেদবুদ্ধিযুক্ত সমাজ সাধনভজনের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা'য় সাধারণ মানুষের উপর সংগঠিত জমিদার এস্টেটের কর্মচারীদের শোষণের চিত্র প্রকাশ করলে কাঙাল হরিনাথকে যখন সরাসরি জমিদার এস্টেটের লাঠিয়ালদের ক্রোধের মুখে পড়তে হয়েছিল, সাধকের শান্ত নিভৃত জীবনকে বর্জন করে লালন তার শিষ্যদের সাথে হাতে লাঠি তুলে নিয়ে রক্ষা করেছিলেন তার অভিন্নহৃদয় সুহৃদকে। এইভাবেই বাংলার ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক ইতিহাসে লজ্জাজনকভাবে যেমন ক্রমশ যুক্ত হয়েছে মানবতাবাদবিরোধী বেদনাদায়ক এক অধ্যায়, আবার তার পাশাপাশি এই ঘৃণার অন্ধকার শেষে ফুটে উঠেছে মানবতার আলো। বারবার বাউল শিল্পীর কণ্ঠ গর্জে উঠেছে যাবতীয় ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে। মূলত ধর্মান্ধতার কারণেই ঘটে বাউলনিগ্রহের মতো ঘটনা। তবু একথাও অনস্বীকার্য যে, ভারতের যে চিরকালীন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্য, তা বাউলসাধনার মর্মে অনুভূত হয়েছে বলেই হয়তো লোকধর্ম বাউল মানুষের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নৈতিক শক্তিও আনয়ন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের মতো উদার ব্যক্তিত্বও বাউলদের দেহবাদী সাধনার তীব্র নিন্দা করে একে 'নোংরা সাধন' বলে উপেক্ষা করেছিলেন। উক্তিটি দেখে বিস্মিত হতে হয় বৈকি! কারণ যিনি 'যত মত তত পথে'-র মতো বাণীর মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখান, তিনিই ঈশ্বরসাধনার একটি পথ সম্পর্কে এরকম বিরূপ মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের পিছনে হয়তো একদিকে আছে তার পৌত্তলিক ধর্মসংস্কার; আরেকদিকে অন্যান্য ধর্মমতের মতো বাউলমতের মধ্যেও অনেক বেনোজল বা স্পষ্টভাবেই বলা যায়, নারীদেহ, নেশা ইত্যাদির সহজলভ্যতা হেতু বহু ভণ্ডের আগমন ঘটেছে। কিন্তু আলোর বিপরীতে অন্ধকার সর্বক্ষেত্রেই আছে; সুতরাং এগুলি কখনোই বাউলধর্মের বিশ্বমানবতা ও মৈত্রীর প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দিতে পারে না। তাছাড়াও, অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি যেমন একটা সামগ্রিক সমাজকে নিয়ে এগিয়েছে, লোকধর্ম বাউলের সমাজে প্রতিষ্ঠাপর্বের পথটা কখনোই ততটা মসৃণ ছিলনা। এ প্রসঙ্গে শুধু ভারতচন্দ্রের একটি কথাই স্মরণীয়- 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। এই কথাটি মাথায় রেখে হয়তো বাউলদের মতকে মেনে নেওয়া উচিত। জগতসংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হল মানুষ হয়ে মরা; তাই যে আশি লক্ষ যোনি পেরিয়ে একটা মানবজন্ম আসে, সেই মানবজন্মে বাউলসাধক 'মানুষরতন'-কেই খুঁজে যান মানুষের মধ্যে জীবনভর। ধর্মান্ধতা, জাতপাত, শ্রেণিবৈষম্য, নারীর সামাজিক অসাম্যজনিত সমস্যা- এসব মানবতাকে খণ্ডিত করার সর্ববিধ অপসংস্কৃতির বিরোধিতা করে বাউলরা মানুষের সাম্য ও গণতান্ত্রিক সমানাধিকারের দাবি জানায় অবিরত। তবু একথাও স্বীকার্য যে, হয়তো গ্রহণযোগ্যতা সীমিত থাকার কারণে লোকধর্ম বাউল সোচ্চারে কোনো সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে বাউল সাধকরা কখনোই গ্রামবাংলার লোকায়ত সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেননি; তাই প্রথাগত সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে ব্রাত্য লোকসমাজকে নিয়ে এক বিপরীত জীবনচর্যা গড়ে তুলেছিলেন তারা। আহমদ শরীফ তাই হয়তো "বাউলতত্ত্ব" প্রবন্ধে বাউল মতকে যে একান্তভাবেই 'বাঙালীর মানস ফসল' বলে অভিহিত করেছিলেন, তা যুক্তিসঙ্গত।

পরিশেষে এ কথা বলতে হয় যে, মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে মূলত চৈতন্যদেবের আগমনকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণ্য-বৈদিক সংস্কৃতির ভাঙন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ সংক্রান্ত শাস্ত্রের গোড়ামি ও আচারনিষ্ঠতার ভাঙন শুরু হয়েছিল। কিন্তু, তার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা জাত-বৈষ্ণব ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে এই শাখাগুলির সাথে অন্যান্য উদারপন্থী ধর্মীয় মতের মিশ্রণে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল লোকধর্মের ধারাগুলি, যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে বাউলধর্মে। আজ এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে যখন তামাম বিশ্ব মুহ্যমান, তখন এই 'গভীর নির্জন পথ'-কে সম্বল করে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মার্গকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলা মুষ্টিমেয় মানুষগুলি 'মনের মানুষে'-র সন্ধান আদৌ পায় কিনা, সেই অনুসন্ধানকে পার্শ্বে রেখে গ্রহণ করা উচিত বাউলধর্মের উদাত্ত মানবতার সুশীতল আহ্বানকে, কারণ পথের প্রান্তে হয়তো আজো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভগ্ন দেউলের মতো দাঁড়িয়ে আছে অনেক 'মানুষের দেবালয়', অপেক্ষমান আছেন গণদেবতা!

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অন্নদাশঙ্কর রায়, লালন ও তার গান, কলকাতা: শৈব্যা পুস্তকালয়, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০।
২. অলোক রায়, উনিশ শতক, কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১২।
৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ বিশ, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, ১ম সংস্করণ, ১৯২৭।
৪. আনোয়ারুল করীম, বাউল কবি লালন শাহ্, ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৮।
৫. আবদেল মান্নান (সম্পা.), অখণ্ড লালনসঙ্গীত, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৫।
৬.আবুল আহসান চৌধুরী, কালান্তরের পথিক লালন, ঢাকা: মুক্তধারা, ২য় সংস্করণ, ২০১৫।
৭. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁই ও বাঙালি সমাজ, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ১ম সংস্করণ, ২০১৬।
৮. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন শাহ্ ১৭৭৪-১৮৯০, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০।
৯. আবুল আহসান চৌধুরী, সমাজ সমকাল ও লালন সাঁই, কলকাতা: সূচনা কালচারাল সেন্টার, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬।
১০. আহমদ শরীফ, আহমদ শরীফ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১০।
১১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭।
১২. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩।
১৩. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খণ্ড, নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩।
১৪. ক্ষিতিমোহন সেন, হিন্দুধর্ম, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১।
১৫. তপনকুমার বিশ্বাস, লোককবি লালন, কলকাতা: রায়-পন্ডিত পাবলিকেশনস্, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০।
১৬. নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, কলকাতা: কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭।
১৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি: নানা প্রসঙ্গ, কলকাতা: বুক ট্রাষ্ট, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০।
১৮. বসন্তকুমার পাল, মহাত্মা লালন ফকির, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১ম সংস্করণ, ২০১১।
১৯. বিকাশ চক্রবর্তী, বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ২০০৩।
২০. মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্, বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ২০০৬।
২১. রাখাল চন্দ্র নাথ, উনিশ শতক: ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়, কলকাতা: কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০।
২২. শক্তিনাথ ঝা, বস্তুবাদী বাউল, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ১ম দে'জ সংস্করণ, ১৯৯৫।
২৩. শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল ও শিল্প, কলকাতা: সংবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫।
২৪. সনৎকুমার মিত্র, লালন ফকির: কবি ও কাব্য, কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০।
২৫. সুধীর চক্রবর্তী, গভীর নির্জন পথে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১২।

পত্রপত্রিকাপঞ্জি:

১. অনুপ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.), উর্বী, কলকাতা, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৭।
২. ডঃ মাসুদ রহমান (সম্পা.), কমল-কোঠা, কুষ্টিয়া, লালন একাডেমী, লালন স্মরণোৎসব সংখ্যা, ২০১৫।